

মাসিক: সমাজ ও
সংস্কৃতিগত সংকোচ

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

ক্যাম্পে রঙ

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর
মতামত

বিস্তারিত চতুর্থ পৃষ্ঠায়

যা জুনা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার
ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ১০ × বুধবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮

‘মাসিক’ নিয়ে চ্যালেঞ্জ:

সমাজ ও সংস্কৃতিগত
সংকোচ এবং স্বাস্থ্যসম্মত
উপকরণের অভাব

সূত্র: ২০১৮ সালের জুলাই মাসে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন
এবং ইন্টারনিউজের নেওয়া ক্যাম্প ১ই, ১ডব্লিউ, ২, ৭, ৯, ১০,
১৩ এবং ২৬-এ পুরুষ ও নারীদের সাক্ষাৎকার এবং একটি
ফোকাস দলে আলোচনা।

রোহিঙ্গা কিশোরীদের ক্যাম্পে থাকাকালীন যখন প্রথমবার মাসিক*
হয় তখন তাদের সেই সব কঠোর নিয়মকানুন মেনে চলতে বলা
হয় যা তাদের জনগোষ্ঠী মায়ানমারে মেনে চলত - প্রথম মাসিক
চলাকালীন তাদের ল্যাট্রিন ব্যবহার করা ছাড়া বাড়ির বাইরে
যেতে দেওয়া হয় না। আর যখন তারা বাইরে যায় তখনো তাদের
চোখ নিচু করে রাখতে হয়, ছাতা ব্যবহার করতে হয় এবং কোনও
লোহার জিনিস সাথে রাখতে হয়। তারা এই সব নিয়ম মেনে চলে
যেন তাদের উপর জিন** ভর না করে (জিনোর অসোর) বা জিনের
খারাপ নজর না লাগে। এছাড়াও সাধারণত তাদের পরিবার এই
সময়ে তাদের নির্দিষ্ট কিছু খাবার খেতে বারণ করে যেমন লবণ,
রসুন, পেঁয়াজ, আম, বেগুন এবং চিংড়ির মতো কিছু মাছ।

কিছু নারী জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশে আসার পরে এনজিও-র
তরফ থেকে তাদের স্যানিটারি প্যাড এবং বারবার ব্যবহার করা
যায় এমন কাপড় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা বলেছেন যে এখন
আর এই জিনিসগুলো দেওয়া হচ্ছে না। তাই কিছু নারী এনজিও-র
থেকে আগে যে কাপড় পেয়েছিলেন, সেই পুরনো কাপড় ব্যবহার
করছেন আর বাকিরা তাদের পুরনো পোশাক থেকে কাপড় কেটে
নিয়ে ব্যবহার করছেন। বহু নারী জানিয়েছেন যে, মাসিকের
জিনিসপত্রের অভাবে তাদের চলাফেরা করা কঠিন হয়ে উঠেছে

এবং এর ফলে চর্মরোগ হচ্ছে, বিশেষত কাপড় ঠিকমতো
ধুয়ে না শুকানোর ফলে।

“

পুরনো কাপড় ব্যবহার করলে আমাদের
চর্মরোগ হয়।”

- নারী, ১৮, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

যেহেতু বহু নারীর কাছে মাসিকের সময় গোপনীয়তা ও আড়
বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি তাই অনেক নারীই বলেছেন যে তাদের
এমন জায়গায় কাপড় কাচতে এবং শুকাতে হয় যেখানে সাধারণত
মানুষজন যায়না। নারীরা মনে করেন তাদের পাপ লাগবে যদি
ছেলেরা ওই কাপড় দেখতে পায়। যেখানে তেমন জায়গা নেই
সেখানে নারীরা এই জিনিসগুলো ল্যাট্রিনে ফেলে দিচ্ছেন বা
সেগুলো পুঁতে ফেলছেন যাতে সেগুলো দেখা না যায়। মাসিকের
কাপড় ল্যাট্রিনে ফেলা সেগুলো বুজে যাওয়ার একটা কারণ হতে
পারে।

মাসিকের সময় কী কী স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে
রোহিঙ্গা নারীরা বিশেষ কিছু জানেন না। মাসিকের সময় নারীদের
কোমরে বা পেটে ব্যথা হলে তাদের কেউ কেউ এনজিও হাসপাতালে

* রোহিঙ্গা ভাষায় মাসিককে 'হাইজ' বলা হয়, কিন্তু লোকজনের উপস্থিতিতে একে গোসল বলা ভাল।

** অতিপ্রাকৃতিক জীব যাতে মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন।

ব্যথার ওষুধ নিতে যান, কিন্তু অনেকেই মনে করেন মাসিক একটা স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এর জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু নারী জানিয়েছেন যে তাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সামর্থ্য থাকলেও তারা ব্যথা হলে কোনও মৌলবির*** থেকে পানি পড়া**** এনে খান।

নারীরা জানিয়েছেন যে ব্যথার ওষুধের দরকার না হলে তারা সাধারণত মাসিক নিয়ে স্বামীদের সাথে আলোচনা করেন না। মেয়েরাও জানিয়েছে যে তারা কখনোই মাসিক নিয়ে তাদের বাবাদের সাথে কোনও আলোচনা করে না। এরফলে পুরুষরা জানে

না ক্যাম্পের নারীরা কী কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং তাদের নির্দিষ্ট চাহিদাগুলি কী। তাদের ধারণা হল মাসিক একটি মেয়েলি ব্যাপার এবং তাদের মতে মেয়েদের মাসিক হলে তা লুকিয়ে চলা উচিত কারণ এই বিষয়টিকে লজ্জাজনক মনে করা হয়।

“

এটা মেয়েলি ব্যাপার, নারীদের সাহায্য করার জন্য পুরুষদের কিছু করার দরকার নেই।”

- পুরুষ, ৫০, ক্যাম্প ৭

*** ধর্মীয় বিশ্বাস।

**** কোরানের কিছু আয়াত পড়ার পরে পানিতে ফুঁ দেওয়া হয়।

ক্যাম্পে রঙ

কুতুপালংকে দূর থেকে ধূলি-ধূসর বাদামী রঙের দেখালেও এর আঁকাবাঁকা পথে কিছুটা চললেই চোখে পড়ে নানান রঙের জাঁকজমক। নীল লুঙ্গি আর কালো বোরখার ভিড়ে দুলতে থাকে উজ্জ্বল ত্রিপুরা আর নানান লোগো ছাপানো ছাতা। আমরা যখন যোগাযোগের ক্ষেত্রে রঙ ব্যবহার করি, তখন আমাদের বুঝতে হবে রঙগুলো সম্পর্কে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ধারণা কি, কারণ রোহিঙ্গাদের মধ্যেও নানান ভিন্নতা রয়েছে।

রঙের নাম

রোহিঙ্গাদের অনেক রঙের নামই চাটগাঁইয়া বা বাংলা নামের মতো। লাল শব্দটা তিনটি ভাষার ক্ষেত্রেই এক, আর কালো রঙের মধ্যেও অনেক মিল আছে (বাংলায় কালো এবং চাটগাঁইয়া ও রোহিঙ্গায় হালা)। কিন্তু অন্যান্য রঙের ক্ষেত্রে তারা তাদের চারপাশের জগত থেকে নামগুলো বেছে নিয়েছেন। ঠিক যেমন ইংরেজিতে অরেঞ্জ বা ভায়োলেট নামগুলো প্রকৃতি থেকে নেওয়া হয়েছে, মানুষ রঙের নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণনামূলক শব্দ বেছে নেয়। যেমন মানুষ হলুদকে বলেন "অলিদ্দা" বা "জিঁয়া ফুলের রঙ" (ঝিঙে ফুলের রঙ)। বিভিন্ন ধরনের সবুজকে 'পাতার রঙ' (ফাথা রঙ) বা 'টিয়া রঙ' (তুতা রঙ) বলা হয়।

রঙের সাহায্যে যোগাযোগ করা

ত্রাণ সংস্থাগুলি এবং রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে রঙ একটা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এই সামাজিক এবং ভাষাগত ধারণাগুলো মাথায় রাখলে জনগোষ্ঠীগুলি আরও ভালোভাবে পরস্পরের সাথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারবে।

যেমন কোনও পোস্টার বা সংকেতে "বিপদ" বা "সতর্কতা" বোঝানোর ক্ষেত্রে রোহিঙ্গারা ধীরে ধীরে লাল রঙের একটি হাতের সাথে পরিচিত হয়ে উঠছেন। কিন্তু, রঙ বদলে গেলে, মানেও বদলে যায়। একই হাত যদি লালের বদলে সাদা রঙের হয় তাহলে সেটা দেখলে জনগোষ্ঠী "পরিষ্কার হাত" বোঝে।



চিকিৎসার ক্ষেত্রেও জনগোষ্ঠীর সাথে আরও কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্যাম্পে বিতরণ করা গর্ভ নিরোধক বড়ি লাল রঙের ব্লিস্টার প্যাকে দেওয়া হয়েছিল (লাল ফাথা দাবাই), তাই রোহিঙ্গা নারীরা প্রায়ই সেই রঙের প্যাকেটে কোনও ওষুধ দেখলে গর্ভ নিরোধক বড়ি মনে করেন। যেকোনো বাদামী বা গাঢ় রঙের ট্যাবলেটকে আয়রনের বড়ি মনে করা হয়, এবং যাকে মেইট্রা বরি (আক্ষরিকভাবে 'মাটির বড়ি') বলা হয়। যেহেতু জনগোষ্ঠীর মানুষ আগে থেকেই নির্দিষ্ট কিছু রঙের সাথে নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ বা রোগকে সম্পর্কিত করেন, তাই কোনও ওষুধ লিখে দেওয়ার সময় সেটা কিসের জন্য তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা দরকার যাতে বিভ্রান্তি বা ভুল ধারণা এড়ানো যায়।

রঙ এবং প্রতীক

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে রঙ এবং তার সাথে জড়িত প্রতীকগুলোর মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায় - রঙ একটু গাঢ় বা হালকা হলেই 'শুভেচ্ছা' থেকে 'মারাত্মক বিপদে' বদলে যেতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যেও রঙের প্রতীকে মিলও দেখা যায়। দক্ষিণ এশিয়ার বহু জনগোষ্ঠীর কাছেই সাদা পবিত্রতার প্রতীক। রোহিঙ্গাদের সংস্কৃতিতেও এই ধারণা দেখা যায়। মসজিদে যাওয়ার সময় বয়স্ক মানুষেরা তাদের ধর্মনিষ্ঠা ও ভক্তি বোঝানোর জন্য প্রায়ই সাদা পোশাক পড়েন। নারীরা বেশিরভাগ কালো বোরখা পড়েন কারণ কালো রঙের সাথে প্রায়ই গোপনীয়তাকে সম্পর্কিত করা হয়। পশ্চাত্য সমাজের মতোই লাল রঙকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতেও বিপদ এবং হুমকির সাথে সম্পর্কিত করা হয়। জনগোষ্ঠীর বয়স্ক মানুষজন লাল বা সেই ধরনের উজ্জ্বল রঙ পরা পছন্দ করেন না কারণ এই রঙগুলো অপবিত্র মনে করা হয়।

ক্যাম্পে পতাকা

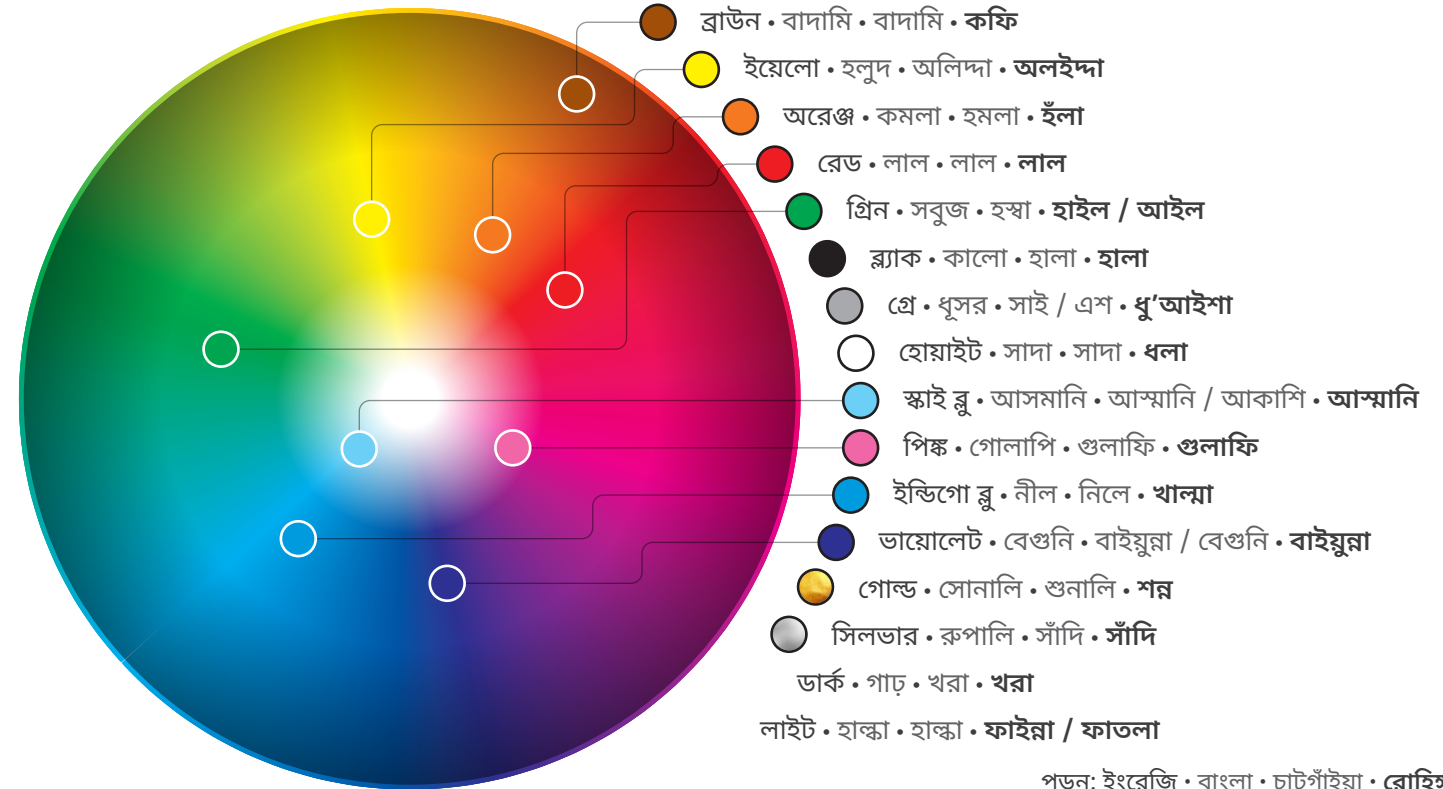
ক্যাম্পে কয়েক পা অন্তরই পতাকা চোখে পড়ে। এগুলো ক্যাম্পের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, যেমন ক্যাম্পের সীমানা বা নির্দিষ্ট সেবা ও কেন্দ্রগুল চিহ্নিত করে। সরকারি এবং সেনাবাহিনীর এলাকায় বাংলাদেশের পতাকা দেখা যায়, যাকে "লাল আর সবুজ পতাকা" (লাল আর আইল রঙ্গের বোটা) বলা হয়। উজ্জ্বল গোলাপি রঙের ব্র্যাকের পতাকা (এবং জ্যাকেট) ক্যাম্পে গেলে চোখ এড়িয়ে যাওয়া কঠিন, তাও কিভাবে 'উজ্জ্বল' (জলজইল্লা) এবং 'গোলাপি' (গুলাফি) বলতে হয় জানা থাকলে কাজে লাগতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের মৌসুমে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতির কর্মসূচী (সি.পি.পি) সতর্কতা দেওয়ার জন্য চোকো লাল আর কালো রঙের পতাকা লাগিয়েছিল (লাল আর হালা রঙ্গের বোটা)। বাংলাদেশে টিকাকরণ অভিযান চলাকালীন যে কেন্দ্রগুলোতে টিকা দেওয়া হয়, সাধারণত সেগুলোর বাইরে একটা শিশুর ছবিসহ ছোট হলুদ রঙের পতাকা লাগানো থাকে। বাংলাদেশীরা এটাকে প্রায়ই মনি পতাকা (শিশু পতাকা) বলে, কিন্তু রোহিঙ্গারা এটাকে অলিদ্দা বোটা (হলুদ পতাকা) নামে ডাকতে শুরু করেছেন।

পরিচয়ের রঙ

জনগোষ্ঠীতে সাক্ষরতার হার কম হওয়ার কারণে জরুরি নথিপত্র চেনার ক্ষেত্রে রঙকে কাজে লাগানো যেতে পারে। কোনও নির্দিষ্ট সেবা বা নথির জন্য নির্দিষ্ট রঙ ব্যবহার করলে সেইসব মানুষদের সুবিধা হতে পারে যারা লেখাপড়া জানেন না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের পরিচয়পত্রের সাথে পরিচয় ঘটেছে। দীর্ঘ সময় ধরে রোহিঙ্গাদের একটি সবুজ রঙের পরিচয়পত্র দেওয়া হত যাকে তারা আইল কার্ড (সবুজ কার্ড) বলতেন। এই কার্ড থাকলে তারা অপেক্ষাকৃত বেশি স্বাধীনভাবে মায়ানমারে চলাফেরা করতে পারতেন। কিন্তু মায়ানমারে ২০১২ সালের ঘটনা এবং তার ফলস্বরূপ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী যে প্রান্তিকিকরণ ঘটেছিল, তার ফলে তাদের সাদা কার্ড (ধলা কার্ড) দেওয়া শুরু হয়। এই নতুন কার্ড নিয়ে তারা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে বা নির্দিষ্ট কিছু সেবা পেতে পারতেন না। পরিচয়পত্রের ক্ষেত্রে, ত্রাণ সংস্থাগুলোর সচেতন থাকা দরকার যে জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষকে এখনো এই সাদা কার্ড মায়ানমারের সৈন্যবাহিনীর হামলার কথা মনে করিয়ে দেয়।

বাংলাদেশে আসার পরে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আলাদা আলাদা রঙের নতুন কতগুলো কার্ডের সাথে পরিচয় ঘটেছে, যেগুলোর ব্যবহারও আলাদা। ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে যখন নিবন্ধিত শরণার্থীরা এসেছিলেন তখন তাদের দুটি কার্ড দেওয়া হয়েছিল, একটি সাদা এবং অন্যটি গোলাপি; দুটিই পরিবারের পরিচয়ের জন্য ব্যবহার করা হত। কিন্তু গোলাপি কার্ডটি (কিন্তু লাল কার্ড বলা হয়) বেশি জরুরি মনে করা হত। এই কার্ডগুলো এখন বাতিল হয়ে গেলেও জনগোষ্ঠীর মানুষজন এখনো সেগুলো সযত্নে রেখে দিয়েছেন। নতুন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে শেল্টার এবং ঠিকানা হলুদ কার্ডে লিখে দেওয়া হয়েছে যাকে জনগোষ্ঠী অলিদ্দা কার্ড নামে ডাকা শুরু করেছে।



রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামত: রাখাইন রাজ্যে পরিস্থিতি, খাদ্যের কার্ড, হাসপাতাল এবং বর্ষাকাল

এই বিশ্লেষণটি ১৮ জন ইন্টারনিউজ জনগোষ্ঠীর সংবাদদাতা এবং একজন ফিডব্যাক ম্যানেজারের দৈনিক সংগ্রহ করা মতামতের ভিত্তিতে করা হয়েছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর গুরুতর আশংকা এবং প্রশ্নগুলো তুলে ধরার জন্য সব মিলিয়ে, ৭০৮টি কথোপকথন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মতামতগুলি রোহিঙ্গা, বর্মী এবং চাটগাঁইয়া ভাষায় সংগ্রহ করা হয়েছে।

ইন্টারনিউজ

১ জুলাই থেকে ১৫ আগস্ট ২০১৮

মোট মতামত



৭০৮

৪২৮

২৮০

রাখাইন রাজ্যে পরিস্থিতি

“ আমরা জানতে পেরেছি যে রোহিঙ্গাদের যেসব জায়গাজমি ছিল তা তারা (রোহিঙ্গা মানুষজন) বাংলাদেশে চলে যাওয়ার পরে বার্মার সরকার নিয়ে নিয়েছে [...]। যারা এখনো বার্মায় আছে আমরা তাদের থেকে এটা জেনেছি। তাই আমরা খুব চিন্তায় আছি যে আমরা কিভাবে বার্মায় ফিরব।”

- পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ১ পূর্ব

“ আমরা বাংলাদেশে জন্মেছি, আর আমাদের এখন বয়স ১৯, ১৮ আর ২৩ বছর। আমরা আমাদের বাবা-মাদের কাছ থেকে শুনেছি যে তাদের যেসব জমিজমা ছিল সব বার্মা দেশের সরকার নিয়ে নিয়েছে। আমরা যখন এসব কথা শুনি তখন সেখানে আর কখনো ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।”

- নারী, ২৩, ক্যাম্প ২ই

গত দুই মাসে আলোচনার একটি প্রধান বিষয় ছিল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মায়ানমারে যে সমস্ত জমিজমা ও সম্পত্তি ফেলে এসেছে তা নিয়ে আশংকা। সম্প্রতি স্বাক্ষরিত এম.ও.ইউ এবং ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর যাচাইকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রে এই আশংকাগুলি উঠে এসেছে। জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্য জানিয়েছেন যে তারা যে শুধুমাত্র (আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে) পরিবারের সদস্যদের হারিয়েছেন তাই নয়, সেই সাথে জমি, বাড়ি, পালিত পশু, নগদ টাকা এবং অন্যান্য দামী জিনিসপত্রও খুইয়েছেন। যদিও তারা জানেন সম্পত্তির অনেকটাই ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আর ফিরে পাওয়া যাবে না, তবুও জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যে জমিতে বসবাস করতেন সেটার কী অবস্থা তা জানতে তারা অত্যন্ত আগ্রহী। জনগোষ্ঠীর অনেক সদস্যই আশংকা করেন যে তাদের যা কিছু ছিল সেই সবকিছু মায়ানমারের সরকার এবং রাখাইনের বাসিন্দারা নিয়ে নিয়েছে। তাই রাখাইন রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রোহিঙ্গা মানুষেরা যে জমি ছেড়ে এসেছে তার অবস্থা জানানোর জন্য অনেক অনুরোধ এসেছে। এদিকে ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে এবং ২০১২ সালে যে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে এসেছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ আদৌ প্রত্যাবাসন হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহান এবং মায়ানমারে আর ফিরে যেতে চান না।

খাবার

“ আমরা খাবারের কার্ড পাচ্ছি না কেন? মধুরছড়ায় যারা থাকে তারা পেয়েছে। আমরা কেন পেলাম না? আমরা খুব কষ্টে আছি, আমরা যা চাই তার কিছুই কিনতে পারি না।”

- নারী, ৩৫, ক্যাম্প ১ ডব্লিউ

“ আমরা আজকাল যে চাল পাচ্ছি তা খুবই খারাপ। এটা রান্না করার সাথে সাথেই নরম হয়ে যাচ্ছে আর গন্ধও খুব বাজে। ভাত রান্না করার সময় পানির পরিমাণ একটু কমবেশি হলেই এটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা খারাপ হয়ে গেলে আর গন্ধ বেরোলে আমার সন্তানরা ভাত খেতে চাইছে না। আমি এটা কাউকে বলিনি কারণ আমি জানি না কোথায় গিয়ে অভিযোগ করতে হবে। একজন প্রতিবেশী আমাকে বলেছে [সংস্কার] অফিসে যেতে, কিন্তু আমি জানি না ওটা কোথায়। কোনও এনজিও সাহায্য করলে খুব ভালো হয়। কী ধরনের সাহায্য? তারা যদি আমাদের বলে দেন যে কোথায় যাব আর এই সমস্যার জন্য কী করব, তাহলে খুব ভালো হয়।”

- পুরুষ, ৪৬, ক্যাম্প ১ পূর্ব

২০১৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে ইন্টারনিউজ যে সমস্ত মতামত সংগ্রহ করেছে তাতে খাবারের সমস্যা একটা বড় জায়গা জুড়ে ছিল। আগে খাবারের ব্যাপারে মতামতে প্রধানত অপরিষ্কার খাবার, খাবারে বৈচিত্র্যের অভাব এবং বিতরণ করা খাবার পাওয়ায় সমস্যা তুলে ধরা হত। কিন্তু গত দুই মাসে খাবার সংক্রান্ত মতামতে দুটি প্রধান সমস্যা ধরা পড়েছে: যখন কোনও শিশুর জন্ম হয় বা কারো বিয়ে হয় তখন খাদ্যের কার্ড আপডেট করা নিয়ে সমস্যা; এবং জনগোষ্ঠীর মানুষ যে চাল পাচ্ছেন তার মান। মানুষজন জানিয়েছেন যে গত দুই মাসে চালের মান খুব খারাপ হয়ে গেছে।

“ আমার ছেলে গত ছয় বছর ধরে রোগে ভুগছে। বাংলাদেশে আসার পরে আমরা [হাসপাতালে] গিয়েছিলাম। ওরা আমাদের কক্সবাজার থেকে ওষুধ কিনতে বলেছিল। হাসপাতালের ডাক্তার কিছু চিকিৎসা করেছিলেন তারপর তিন মাস ওষুধ খেতে বলেছিলেন। কিন্তু ওরা আমাদের মাত্র ১০ দিনের ওষুধ দিয়েছিল। বাকি ওষুধ বাইরে থেকে নিতে বলেছিল। আমি বাইরে থেকে ওষুধ কিনতে গেলে আমাকে ১০০০ টাকা খরচ করতে হবে। আমার কাছে একটা টাকাও নেই।”

- নারী, ৩০, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

“ হাসপাতালের কর্মীরা আমার বন্ধুকে ভুল ওষুধ দিয়েছিল, ওটা প্রেসক্রিপশনে লেখা ছিল না। যখন আমি জানতে চেয়েছিলাম কেন প্রেসক্রিপশনে লেখা ওষুধ না দিয়ে অন্য ওষুধ দিয়েছে, কর্মীরা রেগে গিয়েছিল আর কোনও জবাব দেয়নি। আমাদের ঐ ওষুধ নিয়েই বাড়ি যেতে হয়েছিল, আমাদের আর কিছু করার ছিল না। আমার বন্ধু ঐ ওষুধ খেতে ভয় পাচ্ছিল।”

- পুরুষ, ৩৫, কুতুপালং আর.সি

“ আমাদের বাড়ির অবস্থা ঠিক আছে, কিন্তু ভারী বৃষ্টি হলে ঘরে পানি ঢুকে যায়। আমার ঘরের ছাদের ত্রিপল ছিঁড়ে গিয়ে সেখান থেকে পানি ঘরের ভিতরে ঢুকে গিয়েছিল। ঘরের ভিতরে থাকা খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল।”

- পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

“ যে সপ্তাহে ভারী বৃষ্টি হয়েছিল তখন কোনও এনজিও থেকে আমরা কোনোরকম সাহায্য পাইনি। যখন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমরা প্লাস্টিকে মুড়ে কোনও রকমে আমাদের জরুরি জিনিসপত্র বাঁচিয়েছি।”

- পুরুষ, ৪২, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

“ আমরা দুটো ত্রিপলের টুকরো দিয়ে ঘরের ছাদ বানিয়েছিলাম। ভারী বৃষ্টিতে সেগুলো এখন ছিঁড়ে গেছে। আমাদের তিনটা ত্রিপল দরকার। ঘর তৈরি করার জন্য দড়ি বা অন্যান্য জিনিস আমরা পাইনি।”

- নারী, ৩৫, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

হাসপাতালে গেলে সম্মান দিয়ে চিকিৎসা করা হয় না - এই স্কোভের কথা জনগোষ্ঠীর কিছু মানুষ জানিয়েছেন, আর কিছু মানুষ চিকিৎসা ও ওষুধের মান নিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। কিছু ডাক্তারকে বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক মনে করা হলেও, হাসপাতালের যে কর্মীরা প্রাথমিক পরীক্ষা করেন, কোথায় যেতে হবে বলে দেন এবং ওষুধ দেন তাদের প্রায়ই উদ্ধত এবং সহানুভূতিহীন মনে করা হয়। এমন অভিযোগও করা হয়েছে যে কিছু হাসপাতাল কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীরা রোগীদের ওপর চিৎকার-টেঁচামেচি করেছেন এবং জনগোষ্ঠীর সদস্যরা কোনো প্রশ্ন বা আশংকা জানালে তার কোনো জবাব দেননি। জনগোষ্ঠীর কিছু সদস্য জানিয়েছেন যে তারা এই কারণে হাসপাতালে যাওয়া এড়িয়ে যান।

বর্ষাকাল নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মতামতে যে বিষয়টা সবথেকে বেশী উঠে আসে সেটা হল ঘর তৈরির জন্য আরও মজবুত জিনিসপত্রের প্রয়োজনীয়তা, বিশেষত ছাদের জন্য আরও বেশি পরিমাণে আরও মজবুত ত্রিপলের চাহিদা। এছাড়াও কিছু মানুষ বলেছেন যে ২০১৮ সালের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে হওয়া ভারী বৃষ্টির সময় তারা ত্রাণ সংস্থাগুলোর কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্য পাননি। জনগোষ্ঠীর সদস্যরা আরও জানিয়েছেন যে, কোথা থেকে তারা খাবার পাবেন, কিভাবে তারা তাদের সন্তানদের এবং বয়স্ক মানুষদের দেখাশোনা করবেন এবং ভারী বৃষ্টির সময় কোথায় আশ্রয় নিতে পারেন এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট নির্দেশনা পেলে ভালো হত।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিতভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলি সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলিকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলির চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।